International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 37-43
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.37-43

সৈকত রক্ষিতের কথাসাহিত্যে মানভূমের লোকজ উপাদান: একটি সমীক্ষা

অর্জুন মাঝি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ভারত

Abstract
Saikat Rakshit is one of the fiction writers who emerged in post-independence Bengali Leterature. He is known as 'Bhumiputra of Purulia'. It was known as Manbhum before the year of 1956. After the movement for few years for Bengali language, On 1st November 1956, it was split into two districts. One of them is Purulia and another is Dhanbad. From the childhood Saikat Rakshit was well known about the tribal life and culture of manbhum. So, he has used various type of folk elements from Manbhum in his novels and short stories. His novel 'Dhula Urani' depicts the tribal life and culture of Khariduyara village by the Kumari river. Folk elements like nachni nach , jhumur song, witch belief etc. has been reflected in this novel. His novel 'Sirkabad' presents the financial crises of the poor tribal artisans of village Gurahata, Kalabani, Naktitar, Sirkabad under Arsha thana of Purulia district who were engaged with Gur craft. The financial crises of Mask artists of Dumardih and chairda village has been reflected in his story 'Mukhosh' and the story 'Dhaman' depicts the life struggles of itinerant dokra artists.

Keywords: *Manbhum, Purulia, folk elements, nachni nach, Sirkabad, gur craft.*

'সৈকত রক্ষিতের কথাসাহিত্যে মানভূমের লোকজ উপাদান' আলোচনার পূর্বে 'মানভূম' ও 'লোকজ উপাদান' সম্পর্কে দু'চার কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। বর্তমানে যা পুরুলিয়া জেলা, একসময় তা মানভূম নামে পরিচিত ছিল। আয়তনে তা বর্তমানের তুলনায় ছিল অনেকটাই বেশি। কারণ, ১৯৫৬ সালের পূর্বে মানভূম ছিল বিহারের অন্তর্ভুক্ত। ১৮০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের হাতে যে জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হয়েছিল, তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল মানভূম। পুরুলিয়া ও ধানবাদ ছিল মানভূমের দুই সন্তান। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের সর্দারেরা বিদ্রোহ শুরু করলে জঙ্গলমহল ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতে যে সকল ছোটো ছোটো জেলা গঠিত হয়, তার অন্যতম একটা হল মানভূম জেলা। আবার, ১৯১১ সালে নতুন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলেন। মানভূমকে করে দেওয়া হল সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ফলে, মানভূম চলে গেল বিহারে। মানভূমের বেশিরভাগ অংশের জনগণের মাতৃভাষা

ছিল বাংলা। কেবলমাত্র ধানবাদের কিছু কিছু স্থানে হিন্দি ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিহার সরকার চাইলেন মানভূমে জোরপূর্বক হিন্দি ভাষা চালু করতে। ফলে, বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জনগণ আন্দোলনে নেমে পড়ে। তার কয়েক বছর পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানেও চলছিল ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তান সরকার উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করলে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ প্রতিবাদে নেমে পড়ে। সেটা ছিল ১৯৫২ সাল। আন্দোলন চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ বাহিনী। তাতে আন্দোলন আরও জোরদার হতে থাকে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে সৃষ্ট সেই ভাষা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে মানভূমের ভাষা আন্দোলনেও। এক্ষেত্রেও পুরুলিয়ার আদিবাসী কুড়মি জনগণ রোষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রতিবাদে নেমে পড়ে। পুরুলিয়াকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীন জেলা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। টুসুগানেরর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। বাঙালিদের মুখে মুখে ঘুরতে থেকে নিচের এই টুসুগান –

“ শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ দেখাই ।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই ।।”[১]

আন্দোলনের ফল হিসাবে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মানভূম জেলা ভেঙে দুটি জেলা গঠন করা হয়। তার একটি হল পুরুলিয়া আর দ্বিতীয়টি ধানবাদ। মানভূমের দুটি সন্তান পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মানভূমের নাম মুছে গেল চিরকালের মত।

এরপর আসা যাক লোকজ উপাদানের কথায়। ‘লোকজ উপাদান’ বলতে সাধারণত লোকসংস্কৃতিজাত উপাদানগুলিকেই বোঝায়। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, লোকসংস্কৃতি হল একটি সংহত জনসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। এর অন্তর্গত উপাদানগুলি হল লোকসাহিত্য (ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোকসংগীত), লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, লোকগৃহ, লোকখাদ্য ও লোকপানীয়, লোকপরিচ্ছদ, লোকশিল্প, লোকচিকিৎসা, লোকঔষধ, লোকনৃত্য, লোকপ্রযুক্তি, লোকযান, লোকনেশা, লোকক্রীড়া, লোকতৈজস, লোকবাদ্য, ইত্যাদি। আমরা কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন লোকজ উপাদান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো।

বাংলা কথাসাহিত্যে লোকজ উপাদানকে ব্যবহার করে যে সকল কথাসাহিত্যিক জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত। তিনি মানভূমের ভূমিপুত্র। তাই মানভূমের অন্ত্যজ ও আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে তাঁর যেন রয়েছে নাড়ির টান। তাঁর জন্ম ১৯৫৪ সালে পুরুলিয়ার সিন্দরি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সুধাংশু রক্ষিত এবং মাতার নাম সম্পূর্ণা রক্ষিত। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। বাল্যকাল থেকে তিনি পুরুলিয়ার আদিবাসী অধ্যুষিত একাধিক প্রত্যন্ত এলাকা সম্পর্কে গভীরভাবে পরিচিত। পরিণত বয়সে পুরুলিয়ার মানবাজার ব্লকের কুমারী নদীতীরে অনুষ্ঠিত ‘সৃজন’ মেলার একজন অন্যতম আয়োজক। এলাকায় তিনি পরিচিত ‘মেলার লোক’ হিসাবে । অন্ত্যজ মানুষদের সঙ্গে মিশতে যেমন তিনি পছন্দ করেন, ঠিক তেমনি পছন্দ করেন তাদের সম্পর্কে লিখতে। তাই তাঁর হাতে রচিত প্রায় সকল উপন্যাস ও গল্পেই পুরুলিয়ার হাড়ি, মুচি, ডোম, বাউরি,

সাঁওতাল, শবর, সূত্রধর, ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির মানুষের কথা উঠে এসেছে। তাদের জীবন, জীবিকা, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি দিকগুলি অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে সেগুলিতে।

তাঁর হাতে রচিত 'ধূলাউড়ানি'(১৯৯৬) উপন্যাসে কুমারী নদী সংলগ্ন খড়িদুয়ারা গ্রামের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে সেই এলাকায় প্রচলিত নাচনি নাচ, ঝুমুর গান, ডাইনি বিশ্বাস ইত্যাদি দিকগুলির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। নিম্ন সম্প্রদায় থেকে আগত যৌবনবতী, লাস্যময়ী, নাচগানে সুপটু যুবতীদের বলা হয় নাচনি। তাদের দ্বারা পরিবেশিত নাচ হল নাচনি নাচ যা মানভূমের একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য ।

> "মূলত গ্রামাঞ্চলেই এই নাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে। সারা দিন মাঠে-ঘাটে-ক্ষেতে-খামারে খাটুনির পরে গ্রামের সব শ্রমজীবী মানুষ ঘরে ফেরেন সন্ধেয়। আহারের পরে তাই একটু রাত করেই এই নাচ সাধারণ ক্ষেত্রে শুরু হয়। প্রায় সারা রাত ধরেই চলতে থাকে এই নাচ। গ্রামের উপান্তে বা বাইরে খোলা মাঠে এই নাচের আসর ।"[২]

উপন্যাসের নায়িকা রিবন ওরফে হাজারি এরকমই একজন দক্ষ নাচনি ও ঝুমুর গায়িকা। যৌবনকালে সে একাধিক রসিকের অধীনে কাজ করে। তাই, সে উচ্চ সমাজের চোখে পরিচিত হয়েছিল একজন কুলটা হিসাবে । গ্রামের মাতব্বরেরা তাকে ষড়যন্ত্র করে গ্রামছাড়া করে । জীবনের একেবারে প্রান্তে উপস্থিত হয়ে সে গ্রামের টানে আবার ফিরে আসে। কিন্তু শেষ জীবনেও উচ্চ সমাজ তাকে বাকি জীবন শান্তিতে কালাতিপাত করার সুযোগ দেয়নি। সমাজপতিরা তাকে শেষ বয়সে ঘোষণা করে একজন ডাইনি হিসাবে। তার জন্যেই নাকি সমাজে নানাপ্রকার অঘটন ঘটে থাকে। কেউ অসুস্থ হলে সকলেই তার দিকেই আঙুল তুলে। তাই, সে একসময় পুনরায় গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। সমাজের চোখে এখনও নাচনিরা কতখানি ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র হয়ে রয়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। একই সঙ্গে মানভূমে প্রচলিত নাচনি নাচের মত লোকনৃত্য ও ঝুমুর গানের মত লোকগানকে উপন্যাসটিতে তুলে ধরে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। এই উপন্যাস ছাড়াও তাঁর 'খেমটি' গল্পেও মানভূমের নাচনি নাচ ও ঝুমুর গানের জীবন্ত চিত্র পরিবেশিত হয়েছে।

মানভূমের ভাষায় নাচনিকে বলা হয় খেমটি। জনৈক রসিকের দ্বারা অন্য রসিকের নাচনি লুণ্ঠনের কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে 'খেমটি' গল্পে । গল্পের শুরু হয়েছে একটি ঝুমুর গানের মধ্য দিয়ে –

"হামার ভাবিতে জনম গেল
হামার কাঁদিতে জনম গেল
বঁধু তুমারি তরে -------"[৩]

পুরুলিয়ার চেপুয়া গ্রামের রসিক হাতিরাম মাহাত শালডিহা গ্রামে খেমটি নাচ চলাকালে আসর থেকে তুলে নিয়ে আসে কাণ্টাডি গ্রামের রসিক বনমালী রাজোয়াড়ের খেমটি যমুনাকে। যমুনা সেক্ষেত্রে একজন অসহায় নারী। তার করার কিছু থাকে না। আগের পুরুষটির মত এই পুরুষটিকেও মেনে নিতে হবে তাকে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব দেবে না রসিকেরা। তাকে কেন্দ্র করে দুই রসিকের দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। দুই দলের লোকজনই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যমুনা আর তাদের কাছে ধরা দিতে চায় না। তাই-

> "একটার পর একটা আল ডিঙিয়ে সে প্রাণপণ দৌড়তে থাকে ।"[৪]

তাঁর 'সিরকাবাদ'(২০০১) উপন্যাসে পুরুলিয়া জেলার আড়শা থানার অন্তর্গত সিরকাবাদ ও তার আশেপাশে অবস্থিত গুড়াহাটা, কলাবনি, নাকটিটাড় গ্রামের দরিদ্র আদিবাসী ইক্ষুশিল্পীদের অর্থসংকটের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তার পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে গুড়শিল্পের জীবন্ত চিত্র। আখের রসকে বলা হয় পানা বা সিরকা । ইক্ষু থেকে রস বের করে গুড় তৈরি পর্যন্ত রয়েছে দরিদ্র আদিবাসী কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম। কারণ, পানা বা সিরকাকে বড় আকারের উনুনে বসানো বড় আকারের কড়াইয়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গুড় তৈরি করা হয় । তা যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনি অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার। আর্থিক দিক থেকে তারা অত্যন্ত দুর্বল। তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে প্রথম শত্রু পোকামাকড় ও হাতির উপদ্রব। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় শক্তিশালী শত্রু মহাজনদের শোষণ-পীড়ন। প্রথম শত্রুর মাধ্যমে তাদের শস্যের উৎপাদনে ক্ষতি হয় এবং দ্বিতীয় শত্রু তাদের সুদে টাকা ধার দিয়ে তাদের নানা দিক থেকে আর্থিক শোষণ করে। চাষের সময় তাদের কাছে টাকা ধার নেওয়ার ফলে, দরিদ্র আদিবাসী কৃষকেরা তাদের কাছেই গুড় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বেশিরভাগ সময় তারা ইক্ষু চাষে লাভের মুখ দেখতে পায় না। তবে, উপন্যাসের কাহিনিতে কলাবনির বীরবল মাঝি, ফতু মাঝি এবং নাকটিটাড় গ্রামের নন্দলাল সিং সর্দার, কুদুং সিং সর্দারের মতো দরিদ্র কৃষকের উপস্থিতি যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি সিরকাবাদ গ্রামের কৃষ্ণকিশোর মাঝি ও গণেশ মাঝির মত অবস্থাপন্ন কৃষকের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতে কৃষ্ণকিশোর মাঝি ও কুদুং সিং সর্দার প্রাণ হারায়। একই সঙ্গে গুড় শিল্পের মতো লোকজ উপাদানকে উপন্যাসে তুলে ধরে ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট । এই উপন্যাসের মত তাঁর 'মাড়াই কল' গল্পেও গুড় শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চেপুলাল বেশরা আখচাষি কুঞ্জের একজন মুনিষ। তার শালঘরে দুটি গরুর সাহায্যে মাদলকে ঘুরিয়ে আখের রস বা পানা বের করার পদ্ধতি লোকপ্রযুক্তির একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত --

> "যখন এমনি সকাল থেকে বেলাডুবু পর্যন্ত মাদল ঘুরবে, তার পাশাপাশি চালাঘরের মেঝেতে বড়োমুখের উনুনে ফুটতে থাকবে গুড় - হাওয়ায় দমকে দমকে ছাই উড়বে, গুড় পুড়বে—ডাবুতে ডাবুতে কড়াইয়ের গুড় টিনে আর টিনের পানা কড়াইয়ে ঢালতে গিয়ে চারপাশটা কেমন চিটচিটে হয়ে পড়বে। আর তখন জমে উঠবে কুঞ্জের এই শালঘর।"[৫]

এছাড়াও, তাঁর 'মহামাস' (২০০৫) উপন্যাসে কর্মকার সম্প্রদায়ের হাপর টেনে লম্ফ তৈরি জীবিকার সংকটের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তাদের তৈরি লম্ফের চাহিদা উত্তরোত্তর কমতে থ্যাকে। ফলে, অর্থ উপার্জনের জন্যে খাঁদু কর্মকারের ছেলে ছুটু কর্মকারকে দেখা যায় ঝালাইয়ের ব্যবসায় নেমে পড়তে।

উপন্যাসের মত তাঁর একাধিক ছোটোগল্পেও পুরুলিয়ার অন্ত্যজ জীবন ও লোকজ উপাদানের ব্যবহার ঘটতে দেখা যায়। বহুদিন থেকে পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে আসা হাড়ি, মুচি, ডোম, বাউরি, খেড়িয়া-শবর, চিত্রকর, সূত্রধরের মত প্রায় অধিকাংশ অন্ত্যজ মানুষ তাঁর ছোটোগল্পে সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছে মুখোশ শিল্প, ডোকরা শিল্প, চিরুণি শিল্প, চর্ম শিল্প, পট শিল্পের মতো একাধিক লোকশিল্পের অতীত ও বর্তমান চিত্র। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'মুখোশ', 'ধমন', 'লক্ষ্মণ সহিস', 'হাম্বা' 'পট' ইত্যাদি গল্পের নাম করা যেতে পারে।

তাঁর 'মুখোশ' গল্পে মুখোশ শিল্পীদের আর্থিক দুর্গতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ডুমৈরডি গ্রামের ভীমা সূত্রধর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। এই গ্রামটি ছাড়াও অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চৈড়দ্যা গ্রামের মুখোশ শিল্পীদের দুরবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে। মাটির মুখোশ তৈরি করার যে পদ্ধতি গল্পে পরিবেশিত

হয়েছে সেটি মানভূমে প্রচলিত একপ্রকার লোকশিল্প। ভীমাকে দেখা যায় কাগজ ও মাটি দিয়ে দু'মাইটা করা মুখোশগুলোতে 'কাবিচ মাটি' করতে। তারপর তার স্ত্রী সচলা সেগুলি শুকোনোর জন্যে উঠোনের রোদে নামিয়ে দিয়ে আসে। শুকানোর পর দেওয়া হয় খড়ি মাটি। তারপর চরিত্র অনুযায়ী সেগুলিতে রঙ ভাঙা হয়। একটা রঙের সঙ্গে আর একটা রঙ মিশিয়ে নতুন রঙ তৈরি করা হল 'রঙ ভাঙা'। শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, রাম, লক্ষ্মণ ইত্যাদি চরিত্রের মুখের আদলে তৈরি মুখোশে –

> "রঙ করা হয়ে গেলে দিতে হয় অ্যারারুট। গরম জলে ফুটিয়ে। এটা শুকোনোর পরে ঘামতেল। ঘামতেল পড়ল মানে মুখোশ বানানোর কাজ খতম। থাকে অলংকরণ বা সাজসজ্জা। সলমা, চুমকি, কাঁঠিমালা, জুহি ফুল, ইত্যাদি দিয়ে চালচিত্র সাজানো হয়। মাথায় বসানো হয় চুল। এই অলঙ্করণ শেষ হলে সেটা 'ফিনিশিং মাল' হয়ে যায়।"[৬]

আবার, তাঁর 'ধমন' গল্পে তুলে ধরা হয়েছে ভ্রাম্যমান যাযাবর ডোকরা শিল্পীদের জীবনসংগ্রাম। জাতিগত দিক থেকে তারা স্বর্ণকার। যদিও তারা বর্তমানে সোনার কাজ করে না। সাধারণত দল বেঁধে কোন গ্রামে উপস্থিত হয়ে রূপা, তামা, পিতলের কাজ করে থাকে। অর্জুন, বাইঞ্জা, রবি, কালীপদ, মালতী প্রমুখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। 'ধমন' হল তাদের শিল্পকর্মে উনুনের সঙ্গে যুক্ত থাকা হাওয়া সরবরাহকারী একটা যন্ত্র। সেই ধমনের হাতল দ্রুত ঘোরাতে থাকলে, ধীরে ধীরে গলে যেতে থাকে তামা, রূপা, বা পিতলের খণ্ডগুলো। তারপর সেই উত্তপ্ত খণ্ডগুলিকে একটি লোহার লেহাইয়ে রেখে ভারি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাসনপত্র বা নানা ধরণের মূর্তি বানিয়ে থাকে তারা। যে মূর্তি বানানো হবে তার জন্যে নির্দিষ্ট ডাইসে গলিত ধাতু ধেলে দেওয়া হয়। তাদের শিল্পকর্মে ব্যবহৃত ছেনি, উঘা, হাতুড়ি, ডাইস, চিমটা, কাতুরি, লেহাই ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আসলে লোকযন্ত্রের অন্তর্গত। এছাড়াও আলোচ্য গল্পে তাদের ডাইনি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করে, ডাইনি কুনজর ফেলে বাণ মেরে দিলে পা ফুলে খোড়া হয়ে যেতে পারে। তাই, ঝুপড়ির কালীপদ স্বর্ণকারের পা ফুলে গেলে সকলে ধরে নেয় কোন অশুভ শক্তি তার পায়ে বাণ মেরেছে । আবার, এই গল্পে উল্লিখিত বিশরি গ্রামের অনন্ত মাহাতর দোকানে যে সমস্ত ঔষধপত্র বিক্রি হয় তার প্রায় সবগুলিই লোকঔষধ। শারীরিক অসুস্থতার সময় পাশাপাশি হাসপাতাল না থাকায় তারা অনন্ত মাহাতর কাছ থেকে সেই সকল ঔষধ কিনে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। একাধিক বিমারির চিকিৎসা করে সে। তাই—

> "বিমারি অনুযায়ী বড়ি থাকে তার হরকিসিমের। টিনের কৌটোতে ভরা । কৌটোর গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা –জ্বর-জললাগা-সন্নিপাত-মাথাঘুরা-পেট গড়বড়-নাক সড়সড় ইত্যাদি।"[৭]

হেলারাম তার কন্যা বুলানির 'গা ছ্যাঁকছ্যাঁক' করা সমস্যার কথা জানালে সে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ দিয়ে দেয় তাকে। সেই সঙ্গে পরামর্শ দেয় –

> "উঠাউঠি খাওয়াবে। ই-বেলা উ-বেলা। যৎক্ষণ না মরিচ তুমার চাঙ্গা হচ্ছে দাওয়ায় চলতেই লাগল। একদিন-দুদিন-দশদিন।"[৮]

এছাড়াও, এই গল্পে বাইঞ্জা চরিত্রটির মুখে একটি লোকগান ব্যবহৃত হয়েছে যাতে ডোকরা শিল্পীদের দুঃখ-দুর্দশার আভাস ফুটে উঠেছে –

"না জানি কী ছিল হামার কপালে
হাজার টাকার বাগান খাইল দু-পওসার ছাগলে
বঁধু হে, এখন কী করি উপায়—

ভবের তরি ডুবল হামার একঘটি জলে…”[৯]

এই দুটি গল্প ছাড়াও তাঁর ‘লক্ষ্মণ সহিস’ গল্পে লক্ষ্মণ সহিস চরিত্রটির মধ্য দিয়ে পুরুলিয়ার ল্যাদামহুল গ্রামের হাড়ি সম্প্রদায়ের চিরুণি শিল্পের দুরবস্থার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। একটি টিলার ওপর অবস্থিত এই গ্রামটিতে মাত্র তেরো ঘর সহিস পরিবারের বসবাস। অন্য কোন সম্প্রদায়ের বসতি সেখানে দেখা যায় না। সেখান থেকে কিছুটা দূরবর্তী এলাকায় পুঞ্চা গ্রামে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বসবাস। ব্যবসার প্রয়োজনে তারাকে সেই গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়্‌। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুলিয়ার এই অন্ত্যজ সম্প্রদায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও সমাজে উচ্চ সম্প্রদায়ের কাছে তারা মনুষ্যোচিত সম্মান পায় না। আবার, অর্থের অভাবে নিজেদের চিরুণি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। তাদের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা অতি অল্প দামে তাদের জমিজমা কিনে নেয়।

গল্পকার তাদের দুরবস্থার পাশাপাশি এই লোকশিল্পটির পরিচয় তুলে ধরেছেন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। চিরুণি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হল মোষের শিং। সেগুলি কেনার ক্ষেত্রে তারাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। কারণ তারা জানে –

> “কাঁচা অবস্থায় ভারী শিং ধীরে ধীরে শুকোয়। এই সময় বেরিয়ে আসে পচা গন্ধ। মাস খানেকের মধ্যে শুকিয়ে ঝনঝন হয়ে গেলে মাটিতে ঠোক্কর মেরে ভেতরের হাড়টা বের করে দেওয়া হয়। শিং তখন ফাঁপা চোঙের মতো। এটা যত বড়ো এবং দামি হয়, তত মজবুত এবং বেশি সংখ্যক চিরুণি পাওয়া যায়। ছোট হলে ওজনের মালে ছাঁট বেরিয়ে যায়।”[১০]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মহিষ আর মারা যায় না। ফলে বাজারে মোষের সিং দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। আবার, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরের নাইলনে তৈরি চিরুণি গ্রামাঞ্চলেও প্রবেশ করে। সেই চিরুণির চাকচিক্যের সঙ্গে তাদের তৈরি চিরুণি পাল্লা দিয়ে টিকতে পারে না। পাইকাররা স্বল্প মূল্যে তাদের চিরুণি কিনতে চায়। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বেশি। ফলে, চিরুণি শিল্পীরা বিকল্প জীবিকার সন্ধানে বের হতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দেয় শ্রমিকের কাজ করতে। কেউ আবার গ্রামে গ্রামে লটারি বিক্রি করতে শুরু করে। অনাদি তাই লক্ষণকে পরামর্শ দেয় –

> “তুমি শিংয়ের ই-সোব চোদ্দ-চুয়াড়ি ছাইড়ে দাও। আর হামার সঙে চলো গাঁয়ে-গাঁয়ে লোটারি বিকবে।”[১১]

কিন্তু, আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও লক্ষণের শিল্পীসত্তা সহজে নতিস্বীকার করে না। তাই,

> “পাড়নের ওপর শিংটা রেখে কুন-বাটালিতে চাপা দিয়ে লক্ষ্মণ তার নিজস্ব ছন্দে করাত রগড়ে যাচ্ছে। বাঁ পা পাট করে মাটিতে শোয়ানো । আর ডান পা লাথি মারার ভঙ্গিতে সে বাড়িয়ে দিয়েছে পাড়নের দিকে। করাতের প্রতিটি আনাগোনায় সুর সুর করে পড়ে শিংযের গুড়ো।”[১২]

কিন্তু, একটা সময় তাদের তৈরি চিরুণির চাহিদা একেবারে তলানিতে এসে পড়ে। শহরের লাইলনের চিরুনিতে বাজার ছেয়ে যায়। হাটেও সেগুলি আর বিক্রি হতে চায় না। তাই, গল্পের শেষে লক্ষ্মণ সহিসকেও দেখতে পাওয়া যায় কোদাল হাতে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে। পরিস্থিতির কাছে হার মানতে বাধ্য হয় তার শিল্পীসত্তাকে।

এছাড়াও তাঁর ‘হাম্বা’ গল্পে মুচি সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্গতির চিত্র এবং ‘পট’ গল্পে চিত্রকর সম্প্রদায়ের পট শিল্পের জীবিকা সংকটের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাই, বলা যেতে পারে মানভূমের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোকজ উপাদানের চিত্র অঙ্কনে সৈকত রক্ষিতের দক্ষতা প্রশংসাতীত।

তথ্যসূত্র:

১। মন্ডল ড. দয়াময়, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার টুসু - ভাদু ও ঝুমুর, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ - ৬ ।
২। সেনগুপ্ত অমিয় কুমার, নাচনি ও নাচনি-নাচ, দ্র নাচনী, নিশীথ চক্রবর্তী, সাগ্নিক, কলকাতা, ২০০২, পৃ - ২৭ ।
৩। রক্ষিত সৈকত, ‘খেমটি’, দ্র সৈকত রক্ষিত, ‘উত্তর কথা’, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ – ১৫৬
৪। তদেব, পৃ – ১৬৫।
৫। রক্ষিত সৈকত, ‘মাড়াই কল’, দ্র সৈকত রক্ষিত, ‘উত্তর কথা’, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ - ৪৬।
৬। ঐ, ‘মুখোশ’, ঐ, পৃ – ১৩১।
৭। ঐ, ‘ধমন’, ঐ, পৃ - ১১০।
৮। তদেব, পৃ -১১০ ।
৯। তদেব, পৃ – ১০৫।
১০। রক্ষিত সৈকত, ‘লক্ষণ সহিস’, দ্র সৈকত রক্ষিত, ‘উত্তর কথা’, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ – ৫৫ ।
১১। তদেব, পৃ – ৫৯।
১২। তদেব, পৃ – ৬০ ।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ –

১। রক্ষিত সৈকত, উত্তর কথা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

সহায়ক গ্রন্থ –

১। অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, নাচনি ও নাচনি-নাচ, দ্র। নাচনী, নিশীথ চক্রবর্তী, সাগ্নিক, কলকাতা, ২০০২।
২। ড. দয়াময় মন্ডল, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার টুসু - ভাদু ও ঝুমুর, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২।
৩। দুলাল চৌধুরী পল্লব সেনগুপ্ত, (সম্পা) লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩।
৪। ব্যাসদেব ঘোষ, বাংলা ছোটগল্পে বৃত্তিজীবীর সংকট(১৯৭০-২০০০), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।
৫। মিতা ঘোষ বক্সি, পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০।